‘উড়নচণ্ডীর পাঁচালি’-পড়ার ভূমিকা-পুস্তিকা

উড়নচণ্ডীর পাঁচালি

সমরেন্দ্র মণ্ডল

উড়নচণ্ডীর পাঁচালি

সমরেন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ
সুলিপ্ত মণ্ডল

মূল বইয়ের নির্বাচিত অংশবিশেষ, এই ভূমিকা-পুস্তিকা
সুপ্রকাশের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে আন্তর্জালে বিতরিত

স্বত্ব : সুপ্রকাশ

সু প্র কা শ

আলবার্তো মোরাভিয়া ‘আমার দেখা ভারত’ গ্রন্থে লিখেছিলেন, ‘নৌকো পৌঁছোলো ঘাটে, একটি লরি, একটি কি দুটি গো-যান, কয়েকটি পরিবার, কয়েকজন ভবঘুরে উঠলো নৌকোর উপর। যেন যা এলো তাই গেল ফিরে, পারাপারের প্রয়োজনটাই যেন ফালতু হয়ে যায়।’ (বঙ্গান্তর : ফাদার দ্যতিয়েন)

এই নৌকাই তো সেই জীবন-নৌকা, যা ভবঘুরের মতো উড়নচণ্ডী জীবনকে এপার-ওপার করে, ঘাটে ঘাটে ভিড়িয়ে দেয়। আসলে, জীবনটাই তো জীবন-ছুট। এ জীবন মেলে তো ও জীবন মেলে না। জীবনে জীবনে যোগ করার কত কথাই তো শুনি। কিন্তু, সত্যি হয় কি? বোধ হয় না। আর, হয় না বলেই চিরকাল

উড়নচণ্ডী হয়ে ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ালাম। এই ঘুরে বেড়ানো বা উড়ে বেড়ানোর বয়সও তো কম হল না। সেই সকাল থেকে বিকেলের দিকে গড়াচ্ছিল যখন বয়স, তখনই বাবা বলেছিল, উড়নচণ্ডীর মতো ঘুরে বেড়ালে চলবে? একটা কাজকামের চেষ্টা করো।

চেষ্টা ছিল না এমন নয়, সকলেরই যেমন চেষ্টা থাকে, সেই জৈবিক চেষ্টা হয়তো ছিল, কিন্তু জীবনটাকে এতোল-বেতোল করে দিতেই আনন্দ ছিল ঢের। কিন্তু, সুয্যি মাঝমাঠ থেকে পেনাল্টির দিকে বল গড়িয়ে দেবার আগেই ঘাটের মাঝি নৌকাটাকে বেঁধে ফেলল খুঁটিতে। পায়ে পড়ল ভদ্দরলোকের বেড়ি। কিন্তু, মন যেখানে রাখাল রাজা, সেখানে বেঁধে রাখে কার সাধ্যি? ভেতরে সেই উড়নচণ্ডীই রয়ে গেলাম। ওড়াটাই যেন নেশা হয়ে গেল। জীবনের পড়ন্তবেলায় যখন হোঁচট খেয়ে দম নেবার ফুরসত মিলল, তখনই ভেসে উঠল ছায়া ছায়া মুখের ছবি।

মাঝে মাঝে মনে হয়, সব মানুষই তো ভেতরে ভেতরে উড়নচণ্ডী। সে গৃহীই হোক, কি, বিবাগী। ‘সংসার, সংসার’ করে এই যে মানুষ হাঁপিয়ে ওঠে, যেন তা উড়তে না-পারার হা-হুতাশ। পায়ে শিকল বাঁধা ময়না যেন, উড়তে চায়, কিন্তু পারে না। যার সাধ্যি আছে সে নাহয় বেরোল, কিন্তু যার সাধ্যি নেই সে তো মনের মধ্যেই ডানা ঝাপটায়। আর ওই যে, যিনি গৃহদেবতা হয়ে বিরাজ করছেন, তাঁর মনটাও কি উড়ু উড়ু করে না? আত্মপরিজনের ‘মানুষ নয়গো— দেবতা বটে’ স্তুতিও কি তাঁকে বাঁধতে পারে? এই যে স্তুতির জলবাতাসা দিয়ে তাঁকে পূজ্য করে তুলল, তাঁরও কি সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না? করে তো। নইলে তিনকালে এসে জীবনের গলুইয়ে বসে কপালের ভাঁজে হাত বুলিয়ে বলে ফেলে— ‘কিছুই পেলাম না রে!’

এই হা-হুতাশ সর্বত্র। জীবনের তৃতীয় সন্ধ্যা বড়ো বিব্রতময়। ওই বুড়িটাকেও বোধ হয় তিনকাল বড়ো জ্বালাত। ওই যে বুড়িটা, ঝাঁটা হাতে উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে চিৎকার করত, ‘মর মর, তিনকালে গিয়ে এককালে ঠেকেছে। তবু মিনসের হুঁশ হল না! মরবি মরবি, একালে মরবি। তোকে কালসাপে খাবে।’

কার উদ্দেশে বলা, শুধু সে-ই জানে। যদি তার অস্তিত্ব থাকে ইহপৃথিবীতে। বুড়ির স্বামী গত হয়েছে বহু বছর। পুত্র-কন্যাও নেই। শ্মশান আগলানোর মতো ঘর-সংসার আগলাচ্ছে। লোকে বলে, মাথাটা গেছে। গ্রামের লোক ঘাঁটায় না। ছেলে-ছোকরার মশকরা-বচন, নাট-বল্টু ঢিলে হয়ে গিয়েছে।

এসব তো ওপরের কথা। ভেতরের কথাটা জানে ক-জন? বুকের ভেতর যে দুঃখ-অভিমান নিয়ে দিনযাপন করছে, তারই-বা হদিশ রাখে কে? দিন আনতে পান্তা ফুরোনোর সংসারের হাল যে কে ঠেলছে তার তো খবর রাখার কেউ নেই, অথচ চলছে। আপন গতিতেই চলছে। জনমানবের কোনো দায় নেই খবর রাখার। রাখে না তো! আর, রাখে না বলেই সেই মাস্টারমশাইয়ের ব্যথাদীর্ণ বুকটাও কেউ দেখতে পায়নি।

ওই যে সেই মাস্টারমশাই, যার শরীরে প্রৌঢ়ত্ব, চুলের ওপর রুপোলি চিকন সুতো, রোদে চিক চিক করে, রোজ সকালে কাঠের হাতলবিহীন চেয়ারে বউকে বসিয়ে স্নান করাত। বউটা উঠে পালিয়ে যেতে চাইত, ধরে বসায়। দু-চার ঘা দেয়। চিৎকার শুরু করে মাস্টার। বউ গলা ফাটিয়ে কাঁদে। পাড়ার লোকজন জড়ো হয় কচাগাছের বেড়ার ধারে। যেন ফিলিমের শুটিং দেখছে। মাস্টার ঝাঁঝিয়ে ওঠে, এখেনে কি যাত্রাপালা হচ্ছে? ভাগ সব। আমি মরছি আমার জ্বালায়, লোকের আর ফুর্তি ধরে না।

ভিড় পাতলা হয়। বউকে চান করিয়ে আড়ালে নিয়ে যায়। এ কাজ তার নিত্যদিনের সঙ্গী। প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারমশাই একাই সংসারে লগি ঠেলে। বাজার করে, রান্না করে, বউকে খাইয়ে তারপর ইস্কুলে যায়।

এসব যখন ঘটে চলে, ঘরের ভেতর বাবু জোরে জোরে ইতিহাস মুখস্থ করে কিংবা একমনে অঙ্ক কষে যায়। তার কোনো হুঁশ নেই। এগুলো জীবনের অলংকার হিসেবে মেনে নিয়েছে। বইয়ের জগৎই তাকে উন্মনা করে রাখে। ক্লাসে প্রথম-দ্বিতীয় হতো। সেই বাবু প্রথম ডিভিশনে ক্লাস ইলেভেনের উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করে বি এসসি পড়তে গেল। ততদিনে তার মায়ের প্রয়াণ ঘটেছে।

সেদিনও পাড়ার লোক ভিড় করেছে। কচাবেড়া পেরিয়ে ঢুকে পড়েছে উঠোনে। মাস্টার সেদিন খেদিয়ে দেয়নি কাউকে। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে প্যানিং শটের মতো শুধু চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। পাড়ার ছেলেরাই মতিচ্ছন্ন বৃদ্ধার মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করেছিল। বাবু সেদিনও ঘরের সামনের সিঁড়িতে বসে ছিল নির্বিকার। ওর দিদি এসেছিল স্বামী নিয়ে। তাকেই কেবল কাঁদতে দেখেছিল সকলে। বাকিদের শুধু উদাস চাহনি।

এই মৃত্যু নিয়েও কম কানাঘুসো হয়নি। আগের দিনও বুড়িকে স্নান করিয়েছে মাস্টার। বাবু ঘরে ছাত্র পড়িয়েছে। সে বি এসসি পাশ করে এখন ছাত্র পড়ায়।

মাস্টার অবসর নিয়েছে। পরদিন সকালে পাড়ার ছেলেদের ডাকাডাকি করল মাস্টার। সকলে গিয়ে দেখল বুড়ি মরে কাঠ। সৎকার তো হবে, ডাক্তারের সার্টিফিকেট তো লাগবে। ডাক্তার কোথায়? খোঁজ খোঁজ। কে একজন এক বৃদ্ধ ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকল। এলএমএফ। শহরের বেশ নাম আছে। অবিনাশ ডাক্তার। তিনি এসে কল গিয়ে পরীক্ষা-টরিক্ষা করে, সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে বিদায় নিলেন। যখন তিনি ফিরতি রিকশায় উঠলেন, খুব কাছে গিয়ে নীচুস্বরে শুধালাম, ‘কী বুঝলেন?’ ডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন, ‘হার্ট অ্যাটাক।’

ডাক্তার যা লেখার লিখেছেন, কিন্তু মানুষের কানাকানি ঠেকাবে কার সাধ্যি। সন্দেহটা ঝড়ের মতো বইল ক-দিন— মাস্টার নিজেই পরিসমাপ্তি ঘটায়নি তো!

সেই থেকে বাড়িটা কেমন ছমছমে হয়ে গেল। মাস্টার চুপচাপ। বাবুও। বাড়ি জুড়ে শোকের আবহ। শুধু বাবু যখন সকালে টিউশন পড়ায়, তখনই ছাত্রদের কলকাকলিতে বাড়িটা মুখর হয়ে ওঠে। তাও কতক্ষণের জন্য? দু-এক ঘণ্টা। বাকি সময়টা ঘড়ির নিয়মে চলে। মাস্টার ইস্কুলে চলে যায়। বাবু ঘরে একা। কলেজের পড়া শেষ। পাড়ার কারো সঙ্গে মেশে না। কথা বলে না। মাঝে মাঝে বাজারের থলি হাতে পথ হাঁটে উদাসী মনে। যেন সে চলেছে কোন নিরুদ্দেশের পথে।

তা, সেই বাবু একদিন হারিয়ে গেল। বাজারের থলি হাতে বেরিয়েছিল, আর ফেরেনি। অনেকদিন অপেক্ষা করেছিল প্রতিবেশীরা। ফেরেনি। মাস্টার থানা-পুলিশ করেছিল কি না কেউ জানে না। মাস্টার একা। নিরাসক্ত, সন্ন্যাসীর মতো ধ্যানগম্ভীর। মাঝে মাঝে মেয়ে-জামাই আসে। দু-চারদিন থাকে। তারপর নিজের সংসারে ফিরে যায়। আর মাস্টার সকাল-সন্ধে উঠোনে দরজার সামনে কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে থাকে। দূর নীলিমায় ছড়িয়ে দেয় চোখ। বোধ হয় খুঁজে বেড়ায় পুরোনো সংসার। বাতাসে সাদা ফেঁসোর মতো চুল খুঁজতে থাকে। নিজের সঙ্গে কথা বলে মাস্টার। কখনো বিড়বিড় করে, কখনো একটু জোরে। নিজেই ঝগড়া করে, হাসে, অভিমান করে। পাড়ার লোকেরা বলে, মাথায় ছিট হয়েছে। কচি ছেলের দল বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি দেয় পরম কৌতূহলে। হাতছানি দিয়ে ডাকে মাস্টার। ওরা ভয়ে পালায়। আবার কোনোদিন হয়তো একটা কঞ্চি নিয়ে চিৎকার করে শাসন করে কাউকে। আসবাবপত্রের ওপর

পড়ে কঞ্চির ঘা।

কোথা থেকে খবর পেয়ে মেয়ে-জামাই এসে বাবাকে নিয়ে চলে গেল। ঘরে তালা। তারপর বহুদিন ঘরে কারো পা পড়েনি। পথের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বাড়িটা। সন্ধে হলেই মনে হয় গুমরে কাঁদছে বাড়ির ইটগুলো। কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, বেজির নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে বাড়িটা। নির্জন বাড়িটায় জ্যোৎস্না যখন খেলে বেড়ায়, তখন সে গুমরে গুমরে কাঁদে। মুখে মুখে রচিত হয় কল্পকাহিনি। অমাবস্যার রাতে মাস্টারের বউ আসে, ঘুরে বেড়ায়। একদিন নাকি বাবুও দাঁড়িয়ে ছিল উঠোনে। নাম ধরে ডাকতেই সব ভোঁ ভোঁ। ভ্যানিশ।

অনেকেই বলে মৃত্যুর পর অতৃপ্ত আত্মারা নাকি ঘুরে বেড়ায়। অপঘাতে মৃতরাও নাকি খোঁজখবর করতে আসে। জানি না। এমন কোনো মৃতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। সুতরাং, তাদের সাক্ষাৎকারও নিতে পারিনি। তবে, মৃত্যু নিয়ে, আত্মা নিয়ে মানুষের দ্বন্দ্ব আছেই। আর, আছে বলেই তো এত অলৌকিক কাহিনির ছড়াছড়ি।

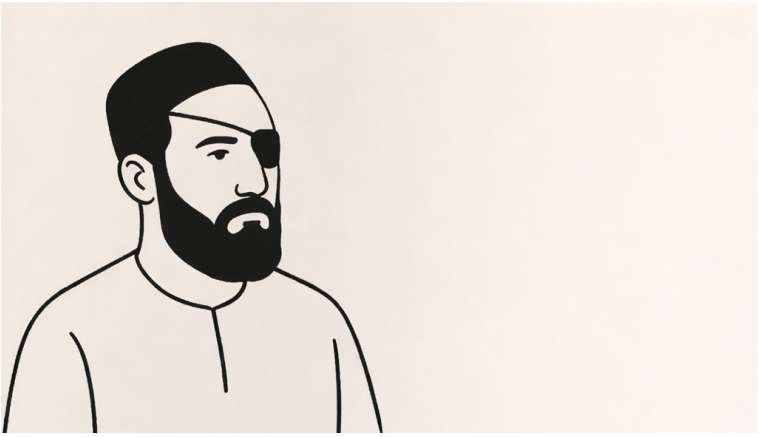

অশান্ত দিনের ছিন্নপত্র

অনেকদিন পর স্মৃতির শহরে পা দিয়ে সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। অবিরত চেনামুখগুলো কোথাও ধূসর, কোথাও ছায়া ভেঙে সামনে চলে আসে। কখনো আবার কোনো প্রাচীন ঘোলাটে চোখ তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে। তারপর দন্তবিহীন মাড়ি ছাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, কীরে, কেমন আছিস? কবে এলি?

তখন তার ঘোলাটে চোখ চকচক করে ওঠে। বেরিয়ে আসতে চায় দ্যুতি। ছুটোছুটি করতে চায় সামনে ছড়িয়ে থাকা সবুজ মাঠের ওপর।

তাকিয়ে থাকি আমিও। উত্তর দিই, ভালো। কাল এসেছি। তুমি কেমন আছ?

—এই আছি। তোর ঘরের খবর কী? সব ভালো তো?

কুশল সংবাদ বিনিময় চলছে, আর আমি ভেতরে ভেতরে হাতড়ে চলেছি নাম। এই প্রাচীনের নামটা মনে করতে পারছি না। প্রাচীনত্ব কিছুক্ষণ দম ধরে বসে রইল। তারপর পেনাল্টি কিক মারার মতো শব্দ ছিটকে দেয়, ‘মনাটা মরে গেল।’ কোনো আবেগ নেই। দুঃখ নেই, শুধু সংবাদ। সেই ছিটকে আসা শব্দ দু-হাতে লুফে নিয়ে বললাম, ও তো আলাদা বাড়ি করেছিল।

—বড়দাকে মনে আছে? সুনীলদা? সেও মারা গেছে।

—শুনেছি।

কথাটা বলার সঙ্গেসঙ্গে নামটা ভেসে উঠল— নীরজদা। ভালো ফুটবল খেলত।

শহরে প্রথম ডিভিশনে খেলত। কাজ করত কারখানায়। খেলা, কাজ আর সংসার নিয়েই ছিল তার যাপন। এখন, এই প্রাচীন বয়সে বাড়ির সামনে একটা গুমটি চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে থাকে। নিজের উত্তরে কথা বলতে বলতে দিন গোনে জীবন অবশেষের।

এগিয়ে চলি। চেনামুখের ভিড় পাতলা হয়ে আসছে। অচেনা তরুণ মুখের মিছিল। স্বাভাবিক। এটাই তো হওয়ার কথা। তারই মাঝে কালের সাক্ষী হয়ে কেউ কেউ বয়ে যায়। আর রয়ে যায় বলেই এই নতুনের হাটেও তারা সমান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে।

এই ভাবনা মেনে নিতে নিতে স্মৃতির পথ ধরে হাঁটি। জীবনের নুড়িপাথর বিছোনো পথে হাঁটি। হাঁটতে হাঁটতেই চোখ যায় সামনের দিকে। ঢোলা পাজামা, লম্বা পাঞ্জাবির, গোঁফ-দাড়ি আচ্ছাদিত এক মৌলবি এগিয়ে আসছে। মাথায় টুপি। হাঁটার ছন্দ পরিচিত। যত কাছে আসছে, তত আগল খুলছে। মুখোমুখি হতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। হজ।

প্রত্যুত্তর না-দিয়েই জড়িয়ে ধরল। কতদিন পর দেখা। কেমন আছ? তোমার সব খবরই পাই।

—তুমি কেমন হজ? তোমার দোকান?

—আছে, দোকান আছে। এখন কিতাব গড়াই।

—কবিতা লিখছ?

—লিখছি। সব পত্রপত্রিকায়। এবার একটা বই করব ভাবছি। ক-দিন আছ?

—আছি, দিনতিনেক।

—বিকেলে দোকানে এসো। গল্প করা যাবে। শুনেছ, মালি মারা গেছে?

—তাই নাকি? কবে? কোথায় মারা গেল?

—তা, মাস ছয়েক হয়ে গেল। ওপারেই মরেছে। মরার আগে একবার এয়েল।

মালি— সেই মালি। সবসময় ছিল হজরতের জিগরি দোস্ত। পরে ঘোর শত্রু। আরও পরে সহজ সম্পর্ক। মালি ছিল হজরতের ইস্কুলের বন্ধু। পাড়ারও বন্ধু। ওদের একটা দল ছিল। যতরকমের বদবুদ্ধি ওদের মাথায় ঘুরত। তবে সকলেই

যে সমান ছিল, এমন নয়। যেমন, মালি ছিল মারামারিতে ওস্তাদ। দুবলা-পাতলা দেহ নিয়েই ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণ করত। ভালো লাঠি চালাতে শিখেছিল ওই বয়সেই। আবার হজ ছিল শান্ত প্রকৃতির। সে বুদ্ধি জোগাত। স্কুলে হজ বেশ ভালোই ফল করত। মালি ততটা নয়। অনেক সময় ঘষটে ঘষটে পাশ করত। দু-জনেই পড়ত মিশনারি স্কুলে। ইস্কুলে কিন্তু কোনো খারাপ কাজের নিদর্শন ছিল না। বরং, কিছুটা আড়ালেই থাকত তারা, অন্য অনেকের মতো। তা, হজের চোখ একদিন কানা হয়ে গেল। হয় সেই মালির জন্যই।

ওরা আমবাগানে ঢুকে গাছে লক্ষ্যভেদ করছিল একটা ধারালো চাকু নিয়ে। এটা নতুন খেলা। সেদিনই শুরু করেছিল। গাছে একটা দাগ কেটে দূর থেকে ছুরি ছুড়তে হবে, গাছের গুঁড়িতে দাগ দেওয়া জায়গায় বিঁধতে হবে। মোটা আমগাছের গোড়া ছিল বেশ শক্ত। সকলেই ছোড়ে, ছুরি পড়ে যায়। গাছে আর বেঁধে না। হজ দু-বার ব্যর্থ হওয়ার পর, তৃতীয়বারে গাছের অনেকটা কাছে গিয়ে চাকু ছুড়ল। চাকুটা গাছে না-বিঁধে, ধাক্কা মেরে উলটো হয়ে ফিরে এল। কেউ কিছু বোঝার আগেই চাকুর ফলাটা হজের এক চোখে বিঁধে মাটিতে পড়ে গেল। রক্ত পড়তে লাগল হজের চোখ থেকে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা। সঙ্গেসঙ্গে, সদর হাসপাতাল। চোখে ব্যান্ডেজ। ওষুধ, ইঞ্জেকশন। বাড়িতে পড়ে রইল বেশ কিছুদিন। সব দোষটা পড়ল মালির ঘাড়ে। কারণ, সে-ই ছিল পালের গোদা। হজ কারুকে দোষ দিল না। কিন্তু, ওর বাড়ির লোকেরা মালিকে কাঠগড়ায় তুলল। মালি ভয়ে কোথায় গা-ঢাকা দিল।

প্রায় মাসদেড়েক পরে হজ স্কুলে গেল। একটা চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেল। আরও ভালো চিকিৎসার পয়সা তাদের ছিল না। বাপ ছিল দিনমজুর। তখনকার দিনে কতই-বা রোজগার। আর, শহরে তখন ব্যবস্থাও ছিল না। ফলে, হজকে একটা চোখ নিয়েই দিনযাপন করতে হল।

নির্জনে সুরের খেলা

একটু আগে সত্যদার কথা বলেছি। সত্যদা—মানে, সত্য মজুমদার। পেশায় প্রযুক্তিবিদ, নেশায় বেহালাবাদক। বেহালা ছিল তাঁর আনন্দ, তাঁর আবেগ। সুরের সাধনায় তিনি নির্জন হয়ে যেতেন নিজের ভেতর। বোধ হয় তাঁর কখনো মন খারাপ করত না। কখনো মন এপাশ-ওপাশ করলেই বেহালায় ছড় টেনে সুরের নদীতে সাঁতার কাটতেন। ডুবসাঁতার। স্নাত হলে কিছুক্ষণ গম্ভীর দৃষ্টির আঁচল ছড়িয়ে দিতেন নীলিমে। তারপর মৃদু হেসে বলতেন, বলো।

বলার কিছু থাকে কি? শুধু তাঁর সঙ্গে স্নাত হওয়া ছাড়া। সুরের এই ঝরনাতলায় স্নান ছাড়া আর কী-ই-বা হতে পারে! সুরের মতোই তাঁর গভীর দু-চোখে ছিল আলোকবর্ণ। মাঝে মাঝে মনে হত, সারাদিন লোহালক্কড়ের সঙ্গে সহবাস করেও একটা সুরেলা মন কীভাবে পুষে রাখা যায় হৃদয় কোটরে! পরে বুঝেছি, সুর ও সংগীত পারে মানুষকে এভাবে গড়ে তুলতে।

কোন ছোট্টবেলা থেকে দেখেছি তাঁকে। যখন আমরা পুব-পাকিস্তানের দর্শনায় ছিলাম, বাবা দর্শনার কেরু অ্যান্ড কোম্পানির চিনির কলে ছিলেন, সেখানেও ছিলেন তিনি। যখন আমরা চলে এলাম এপারের পলাশিতে, তিনিও এলেন। রামনগর কেন অ্যান্ড সুগার কোম্পানি। সত্তর দশক পর্যন্ত রমরম করে চলত। পলাশির চিনি বিদেশে রপ্তানি হত। বাংলার বাজারে আসত। সত্তরের

দশকেই মূলত শ্রমিক অসন্তোষ, একইসঙ্গে আখচাষিদের উৎপাদনে অনীহা, এই কারখানাকে দুর্বল করে দিল। এখন কারখানা প্রেতপুরীর মতো স্তব্ধ। কত মানুষ কাজ করতেন সেখানে! কত দপ্তর! কত আবাসন! সবমিলিয়ে যেন একটা উপনগরী। কোম্পানির নিজস্ব হাসপাতাল, সমবায়িকা। গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে একটি বিদ্যালয়। এই উপনগরীর গায়ে গা লাগিয়ে দুটো গ্রাম— তেজনগর আর পলাশি। চিনি কারখানার এই উপনগরীকে বলা হল মিল নগরী বা মিল কলোনি।

পলাশিতে এসেও সংগীত সাধনা অব্যাহত ছিল সত্যদার। এই মিল কলোনির পরিধির মধ্যেই ছিল একটা বড়ো পুকুর। লোকে বলত কালীন্দ, তার পাড়ে ইংরেজ বিজয়ের স্মারক, আর সরকারি ডাকবাংলো। এই পুকুরের দু-প্রান্তে দুটি ঝুরিনামা শতাব্দীপ্রাচীন বটগাছ। একটা মনুমেন্টের পাশে, অন্যটা মিল কোয়ার্টারের গায়ে। দুটো বটগাছই ছিল বালক-বালিকাদের খেলার জায়গা। বটের ঝুরি ধরে দোল খাওয়া। দোল খেতে খেতে কতবার যে ঝুরি ছিঁড়ে ধপাস, তার ইয়ত্তা নেই। তা, সেই বটতলায় ছিল কালীর স্থান। সেখানে ঘটা করে কালীপূজা হত। আর, কালীপুজো উপলক্ষে হত বিচিত্রানুষ্ঠান, নাটক। দু-দিন ধরে চলত। সেই নাটকের নেপথ্যে শোনা যেত তাঁর বেহালা। আবার মিল আবাসনের অন্য একটাদিকে এক অশ্বত্থ গাছের নীচে যখন অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন হত, সেখানেও বালকদের তালিম দিয়ে গান গাওয়াতেন। এভাবেই তিনি শুধু মিল কলোনি নয়, আশেপাশের গ্রামেরও শ্রদ্ধেয় প্রিয়জন হয়ে উঠেছিলেন। সেই একই ধারা বজায় ছিল বীরভূমের আমোদপুরে এসেও। আমৃত্যু। সুরের সঙ্গে বসবাস আর অমায়িক ব্যবহার তাঁকে সম্মাননীয় করে তুলেছিল।

সত্যদার মতোই আরেক সাধকের সন্ধান মিলেছিল পলাশিতেই। সুগার মিলেই কাজ করতেন মান্নাবাবু। দীর্ঘ বছরের অচর্চায় নামটা হারিয়ে গেছে। শুধু পদবিটা জেগে আছে শুশুকের মতো। ছড়ানো-ছিটোনো মিল কলোনির পুবপ্রান্তে হাসপাতাল। তার সামনে একটা বিস্তৃত মাঠ। মাঠের একপাশ থেকে শুরু হয়েছে শ্রমিক আবাসন। অন্যপাশে বিস্তৃত আমবাগান, যা তেজনগর গ্রামের সীমানা। এই মাঠের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেয়ে সাদা সিঁথি পথ। গ্রীষ্মের দুপুরে মনে হয় রমণক্লান্ত বিধবার মতো নেতিয়ে আছে। সেই পথের একধারে, আমবাগানের কোল ঘেঁষে একাকী দাঁড়িয়ে আছে পাঁচিল ঘেরা একটা বাড়ি। তার হাত

চারেক দূরে বিশালকায় তেঁতুলগাছ, অন্যদিকে কয়েক পা এগিয়ে বেলগাছ। এই একাকী নির্জন আবাসে থাকতেন মান্নাবাবু। বলতাম মান্নাকাকু। চাকরি করতেন কোম্পানির অফিসঘরে। চলতি কথায় ঘড়িঘর। বাকি সময় নানা কাজ তাঁর। স্বপাকে আহার। সংসারী হয়েও সংসারবিহীন তাঁর যাপন। অন্য কোনো জেলায় থাকতেন তাঁর পরিবার। পলাশিতে তিনি ধ্যানস্থ ঋষি। ছোটোদের কাছে আকর্ষণ ছিল তাঁর গবেষণাগার। সদর দরজা, তিনি থাকাকালীন অবস্থায় হাট করে খোলা। প্রবেশ, প্রস্থান অবাধ। কোনোদিন বিরক্ত হতে দেখিনি তাঁকে। নিজের কাজ করতে করতেই উত্তর দিতেন নানা প্রশ্নের। সহাস্যে। যেন তিনি মজা পেতেন।

আমরা যাওয়া-আসার পথে কখনো-সখনো ঢুকে যেতাম তাঁর ঘরে। লুঙ্গি পরে খালি গায়ে তিনি তখন কোনো রেডিয়ো নিয়ে নিরীক্ষা করছেন। ঘরে একটা চৌকির ওপর নানা আকার-প্রকারের রেডিয়ো। কেউ কেউ হয়তো সারাতে দিয়েছেন। তখন ভাল্‌ব রেডিয়োর যুগ। একদিন দেখি একটা বড়ো রেডিয়োর গায়ে একটা কালো গোলাকৃতি সুইচ লাগাচ্ছেন। বাড়িতে আলো জ্বালানো, পাখা চালানোর জন্য ওরকম কালো-সাদা সুইচ ব্যবহার করা হত। সেই সুইচ লাগিয়ে দিলেন রেডিয়োর গায়ে। তারপর একটা বড়ো তার ঘরে বাতি জ্বালানোর সুইচ কেটে প্লাগ লাগানোর যে সকেট থাকে তাতে গুঁজে দিলেন। বেশ চলল— আকাশবাণী কলকাতা। বার দুই সুইচ অফ-অন করে দেখে নিলেন ঠিকঠাক শব্দ বেরোচ্ছে কি না।

কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কী করলেন?

—ডাইরেক্ট করে দিলাম।

মিল কলোনির কালো রেডিয়ো খারাপ হলেই দিয়ে আসত মান্নাবাবুকে। তিনি হাসিমুখে সারিয়ে দিতেন। কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না। এটা ছিল তাঁর প্যাশন। শুধু রেডিয়ো নয়, পাশের ঘর যেটা ছিল শোবার ঘর, একটা চৌকির ওপর সামান্য বিছানা পাতা, আর একটা কাঠের হাতলঅলা চেয়ার, সে-ঘরটা ছিল অদ্ভুত। ঘরের দেয়ালে ঝুলছে তারসানাই, বেহালা, চৌকির এককোণে দাঁড়িয়ে আছে তানপুরা। একধারে হারমোনিয়াম বসে আছে আলগোছে। একমাত্র কাঠের টেবিলের ওপর তবলা। একটা কাঠের বেঞ্চিতে বাক্স-প্যাঁটরার ওপর শুয়ে থাকত সেতার। অনেকটা বয়স পেরিয়ে এসে সংগীতসাধক ভি.

বালসারার ঘরে এরকম দেখেছিলাম। তবে, সেটা ছিল তাঁর মিউজিক রুম। গণসংগীত শিল্পী অজিত পাণ্ডের বাড়িতেও দেওয়ালে বাদুড়ের মতো ঝুলত নানা বাজনা। একটা ভিয়েতনামের বাজনাও দেখেছিলাম। এসব দেখতে দেখতে সেই হাফপ্যান্ট বয়সে দেখা মান্নাবাবুর কথা মনে পড়ল। একজন নির্জনপ্রবাসী সুরসাধক।

মান্নাবাবুর বাড়িতে মাঝে মাঝে বসত গানের আসর। বেশ রাতে। এলাকার সংগীতসাধকরা আসতেন। চলত শাস্ত্রীয় সুরের চর্চা। তিনি নিজেও কণ্ঠচর্চা করতেন। অনেকরকম বাজনা ছিল তাঁর অধিগত। পাড়ার দু-একটি মেয়ে রোববার সকালে তাঁর কাছে গান শিখত। শাস্ত্রীয় সংগীতের পাশাপাশি রবীন্দ্রসংগীতেও তালিম দিতেন। এই সুরের মায়াজালে জড়িয়ে পড়ল উড়নচণ্ডীও। কী কারণে জানি না, তারসানাইয়ের দিকেই তার মন গেল। মান্নাকাকুর তত্ত্বাবধানে চলল বছরখানেকের চর্চা। তারপর পড়াশুনোর স্বার্থে পলাশি ত্যাগ করার পর সে-বাসনায় ছাই পড়ল। অন্য আকর্ষণে পলাশি সরতে লাগল। ক্রমশ ধূসর হয়ে গেলেন মান্নাকাকু।

অনিলদার ছবি

অল্পস্বল্প আলাপ হয়েছিল সিনেমাপাড়াতেই। কোনো এক সিনেমার শুটিং পর্বেই আলাপ। খুব মিশুকে লোক ছিলেন তিনি, জমিয়ে আড্ডা দিতে পারতেন। বললেন, ‘তুমি তো বসুশ্রী কফি হাউসে বসো।’

বললাম, ‘হ্যাঁ।’

তখন রবিবার সকালে আমি, তরুণ চৌধুরী আর কয়েক জন বসুশ্রী কফি হাউসে বসতাম। শিয়ালদার বোর্ডিং হাউসে থাকি তখন। ওই বসুশ্রীতেই অন্যপাশে অনিল চট্টোপাধ্যায় বসতেন কয়েক জন সিনেমা-লেখকের সঙ্গে। তাঁরা সিনেমা সমালোচনা ছাড়াও তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে লিখতেন। তবে, সিনেমাপাড়ার সঙ্গে তেমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। ওখানেই তিনি দেখেছিলেন আমাকে।

শুটিং-এর ফাঁকে কথা বলতে বলতে বেশ জমে গেল। আসলে, তিনি তো ছিলেন আড্ডাবাজ। তবে, মাঝেমধ্যেই তিনি উধাও হয়ে যেতেন। চলে যেতেন ঘাটশিলায়। ওখানে ‘বিভূতিভূষণ স্মৃতিরক্ষা কমিটি’র সভাপতি ছিলেন। সিনেমাপাড়ার শিল্পী-কলাকুশলী সংগঠনেরও তিনি শীর্ষে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদের শীর্ষেও বোধ হয় ছিলেন বেশ কিছুদিন। এত সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে থেকেও কিন্তু মানুষটা এক-শো ভাগ ছিলেন সিনেমার মানুষ।

কয়েক দিনের আড্ডাতেই তিনি জেনে নিলেন আমার হাল-হকিকত। আমিও যে উড়নচণ্ডী, সেটা জেনে বললেন, আমিও তো উড়নচণ্ডী। এখন তো আর হবে না, নাহলে সব ছেড়েছুড়ে কাঁধে ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। মানুষটাকে

দেখলে বোঝা যেত না অশোককুমার-কিশোরকুমার-ছায়াদেবী সকলেই তাঁর নিকট আত্মীয়। কিশোরকুমারের সঙ্গে ছিল তুই-তোকারি সম্পর্ক। একথা শুনেছি তাঁর মুখেই।

সম্পর্ক কেমন সহজ করে তুলতে পারতেন। তারই দু-একটা কথা বলি। এক রোববার আড্ডা মারতে মারতে বেলা বারোটা বেজে গেল। অনিলদাদের দলটা বসুশ্রী ত্যাগ করছেন। আমরা তখনও বসে। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, ‘আরে, তোমরা বাড়ি যাও। এবার তো ভাত বন্ধ হয়ে যাবে।’

আমরা ‘যাচ্ছি’ বলতেই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ও তোমার তো আবার ঘরবাড়ি নেই। আরে, মেসের ভাত ঠান্ডা হয়ে যাবে। ওঠো এবার।’

কথাগুলো ছুড়ে দিলেন বড়দাদার মতো। তারপর হাঁটা দিলেন।

এভাবেই চলছিল। কিন্তু, বসুশ্রীর কফি হাউসে যাওয়া কমে গেল। রবিবারগুলো এদিক-ওদিক বেরিয়ে পড়তাম। অনিলদাও বোধ হয় ছবির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ ছাড়া, শিল্পী সংসদের কাজও ছিল। উত্তমকুমারের পর তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। দু-পক্ষের নিয়মিত অনুপস্থিতির ফলে একটা ব্যবধান তৈরি হল। কিন্তু, আড্ডাবাজরা তো নতুন আড্ডার ঠেক খুঁজে নেয়, কিংবা, নিজেরাই ঠেক তৈরি করে নেয়। একদিন স্টুডিয়োতে দেখা। কোনো একটা ছবির শুটিং করছিলেন। টেকনিশিয়ানস’ স্টুডিয়োতে আড্ডা মারছি কয়েক জন সহকারী পরিচালকের সঙ্গে, হঠাৎ দেখি অনিলদা ফ্লোর থেকে বের হচ্ছেন। কাঁধে সেই চামড়ার ব্যাগ। একটু এগোতেই আমি উঠে গেলাম। ডাকলাম, ‘অনিলদা।’

তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ঘুরেই একমুখ হাসি ছড়িয়ে বললেন, ‘আরে, কী খবর? বসুশ্রীতে নিশ্চয় যাচ্ছ না।’

বললাম, ‘অনেকদিন যাওয়া হয় না।’

‘খুব ব্যস্ত? রোববার সকালে আমার বাড়ি চলে এসো। শঙ্কর ভট্টাচার্য আসে। আরও দু-একজন আসে। এখন বাড়িতেই বসি।’

‘যাব। এই রোববারে যাব।’

গেলাম। ‘দৌড়’ ছবির পরিচালক শঙ্কর ভট্টাচার্য এলেন। আরও দু-একজন এল।

তারা সিনেমা নিয়ে পড়াশুনো করছিল। দুপুর বারোটা পর্যন্ত আড্ডা চলত চা সহযোগে। বিস্কুট থাকত। মাঝে মাঝে থাকত মুড়ি। অনিলদার বড়োছেলের বউ অপূর্ব মুড়ি মাখতেন। মুড়ি অনিলদার বেশ প্রিয় ছিল। এইসব সাধারণ খাবার অনেক প্রথিতযশা শিল্পীদেরই প্রিয়, যা আমার নিজের চোখে দেখা। যেমন, এক রোববারের সকালে তাপস পালের বাড়ি গিয়ে দেখি পান্তাভাত খাচ্ছে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘সকালে পান্তা? আরে, আরও মোটা হয়ে যাবেন যে!’

উত্তরে দাঁত বের করে বললেন, ‘কী করব। ছোটোবেলার অভ্যেস। তেল, পেঁয়াজ, লঙ্কা দিয়ে পান্তা না হলে ঠিক জমে না।’

এমন দেশি খাবার অনেকেরই প্রিয়। যেমন, অনিলদার প্রিয় মুড়ি। তা, প্রায় রোববারেই হাজির হতাম গল্ফগ্রিনে। কোনো সপ্তায় হাজিরা না-দিলে বলতেন, ‘তোমার ফাইন হবে। বড্ড ফাঁকি দিচ্ছ।’

রোববার ছাড়া অন্যদিনও গেছি বিকেল বেলায়। অনিলদাই ফোন করতেন। অফিসের ফোনে। তখন তো মোবাইল ছিল না, আর আমার নিজেরও ফোন ছিল না। যে বোর্ডিং হাউসে থাকতাম (আসলে ছিল বোর্ডিং হোটেল) সেখানেও ফোন ছিল না। দরকার হলে পাশের ওষুধের দোকানে গিয়ে একটাকা দিয়ে ফোন করতে হতো। যাঁরা ফোন করতেন, তাঁরা অফিসেই করতেন। একদিন ফোন পেয়ে সন্ধ্যায় ওঁর বাড়ি গিয়ে বুঝেছি, কোনো কাজ না-থাকায় তিনি গল্প করার কাউকে খুঁজে পাচ্ছেন না। অতএব, এই উড়নচণ্ডীকেই ডাকো। একটা কথা বলে নিই, আড্ডার সঙ্গী হিসেবে একটা শর্ত ছিল, সেসব কোথাও লিখতে পারব না। তাঁর সাক্ষাৎকার নেব ঠিক করেছিলাম। বললেন, ‘রোজই তো সাক্ষাৎ হচ্ছে। আবার সাক্ষাৎকার কীসের?’ কী আর করা যাবে। আমাদের অন্য এক সাংবাদিককে দিয়ে সেই সাক্ষাৎকার নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। তবে, আমাকে সামনে থাকতে হয়েছিল। আর ছিলেন আলোকচিত্রী অর্ধেন্দু রায়। ‘ইত্যাদি প্রকাশনী’র চিফ আর্টিস্ট ছিলেন। আবার, তরুণ মজুমদারের সহকারীর কাজও করতেন।

এভাবেই একদিন জেনে গেছিলাম তাঁর ছবি আঁকার কথা। সেবার তিনি বেশ কিছুদিন শহরে অনুপস্থিত। ঘাটশিলায় গেছেন। ফিরে এসে ফোন।

পরের রোববার গেলাম। চায়ের সঙ্গে পেঁড়া পেলাম। বললেন, ‘দেওঘর থেকে

নিয়ে এসেছি।’

সেবার ‘বিভূতিভূষণ স্মৃতিরক্ষা কমিটি’র কাজ সেরে দেওঘর চলে গিয়েছিলেন। সেসব গল্প বলছিলেন, আর বুকের লোমে হাত বুলোচ্ছিলেন। হ্যাঁ, যখন আমি বা শঙ্করদা থাকতাম, গরমের দিনে লুঙ্গি আর উদোম দেহ নিয়েই আড্ডায় হাজির হতেন। বাইরের কেউ হলে গায়ে একটা হাফহাতা শার্ট গলিয়ে নিতেন। বাড়ির চিলতে বারান্দায় একটা ছোট্ট চৌকি, ছোটো টেবিল আর একটা কাঠের চেয়ার ছিল। আমি চেয়ারে বসতাম, তিনি চৌকিতে। বাড়তি কেউ হলে দু-চারটে ফোল্ডিং চেয়ার ছিল। সেগুলো নিজেকেই খুলে নিতে হতো। খুব হইচই পছন্দ করতেন না। পার্টি-টার্টি নৈব নৈব চ। গান ছাড়া আর কোনো নেশা ছিল না। একসময় সিগারেট নেশার তালিকায় ছিল, সেটাও ত্যাগ করেছিলেন। একটা ছোটো গাড়ি কিনেছিলেন। সেটাও বিক্রি করেছেন। চড়তেন ভাড়ার ট্যাক্সি, কিংবা, অটো। বলতেন, ‘আমি তো অত বড়ো আর্টিস্ট নই যে, গাড়ি চড়ব।’

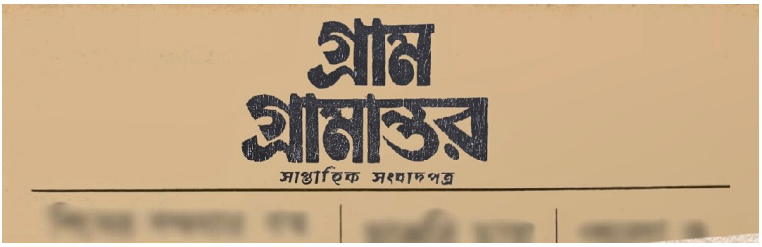
গ্রাম
গ্রামান্তর
সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

পর্দার কবিতায় কালু

যতদূর মনে পড়ছে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছে। স্মৃতি কি একটু বিশ্বাসঘাতকতা করল? হতে পারে। তবে এটা মনে আছে, কয়েক জনের উদ্যোগে কৃষ্ণনগরে পাত্রবাজারে শোভন মুদ্রণী থেকে একটা ট্যাবলয়েড বেরোতে শুরু করে। সংবাদপত্র। সাপ্তাহিক। গ্রাম-গ্রামান্তর। এটুকু মনে পড়ছে এককালীন নকশাল নেতা রামু ব্যানার্জি এই উদ্যোগের সঙ্গে ছিলেন। চার পৃষ্ঠার ট্যাবলয়েড। নিউজপ্রিন্টে ছাপা। প্রকাশক ও মুদ্রক প্রেসের মালিক নীহার বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তাল তরুণ কবি ও গদ্যকার শতঞ্জীব রাহার ওপর। (জনান্তিকে বলে রাখি, একসময় শতঞ্জীব বদলে ‘সতঞ্জীব’ করে নিয়েছিল। জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিল, শত বছর নয়, সৎভাবে বাঁচতে চাই।) আর শতনকে (এই নামেই আমরা ডাকতাম) কাঁধ দেওয়ার জন্য ছিল এই উড়নচণ্ডী। আমরা অবৈতনিক। কীসের টানে, কোন মতাদর্শে যে সংবাদপত্র করে যাচ্ছিলাম, কে জানে! কিন্তু, ক্রমশ নেশা হয়ে গেল। সকাল-বিকেল দু-বেলা প্রেসে হাজির। তারই মাঝে খবর সংগ্রহ, টিউশনি, প্রেসে বসে বিস্তর কাজ। লেটার প্রেসের যুগ। হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকি আমরা দু-জন। টিউশনির পয়সায় মুড়ি চিবুই। ক্রমশ শহরের অন্য ট্যাবলয়েডকে পেছনে ফেলে ‘গ্রাম-গ্রামান্তর’ এগিয়ে গেল।

সেইসময়টা ছিল ট্যাবলয়েডের যুগ। কৃষ্ণনগর থেকে বের হত ‘বিদ্যুৎ’। সাপ্তাহিক প্রতিবাদী কাগজ। বাজারে এলেই অমিল হয়ে যেত। রানাঘাট থেকে বের হত ‘চ্যালেঞ্জ’। খুব নাম করেছিল সরকার বিরোধী কাগজ হিসেবে। সেইসময় প্রায় সব শহর থেকেই বের হত ট্যাবলয়েড সংবাদপত্র। কোনোটা সাপ্তাহিক, কোনোটা পাক্ষিক। বীরভূমের সিউড়ি থেকে ‘চন্দ্রভাগা’ খুব নাম করেছিল। পরে তো ‘চন্দ্রভাগা’ দৈনিকও হয়েছিল। তবে বেশিদিন

জীবিত থাকেনি। আবার সাপ্তাহিকে প্রত্যাবর্তন করেছিল। সারারাজ্যেই ছিল ট্যাবলয়েডের রমরমা। শহর কলকাতাতে এরকম বেশ কিছু ট্যাবলয়েড ছিল। খুব নাম করেছিল ‘কোলফিল্ড টাইমস’। কলকাতায় হোক, কি মফস্বলে, দৈনিক কাগজের সাংবাদিকরা এইসব ট্যাবলয়েডের পেছনে থাকতেন। বেনামে লিখতেন। তবে ‘গ্রাম-গ্রামান্তর’ এগিয়ে ছিল নিজেদের সূত্র ধরে। গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেক বামনেতার অপকীর্তিও ছাপা হয়েছিল। প্রশাসনেও তার প্রভাব পড়ত। ফলে ‘গ্রাম-গ্রামান্তর’ হয়ে উঠল ‘বিদ্যুৎ’-এর প্রতিদ্বন্দ্বী। বাজারে বিদ্যুৎ বিক্রিতে ভাটা এল, এগিয়ে গেল আমাদের কাগজ। ঠিক এই সময় যুব কংগ্রেস নেতা উত্তম গাঙ্গুলি বের করল ‘কৃষ্ণনগর সমাচার’। ছাপা হতে থাকল শোভন মুদ্রণীতেই। আমাদের কাগজ বুধবার, ওদের শুক্রবার। পত্রিকার প্রকাশ সময় ঠিক রাখার জন্য অনেক সময় উত্তপ্ত পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে।

তা, ঠিক সেইসময়ে বিষ্ণু এল প্রেসে। আমি আর শতন বসে কাজ করছি। উদ্দেশ্য, কবিতার পত্রিকা করবে। নীহারদার সঙ্গে কথা বলিয়ে দিলাম আমরা। ষোলো পৃষ্ঠার কবিতার কাগজ। নিউজপ্রিন্টে ছাপা। সেটাই তখন দস্তুর ছিল গরিব কবিদের। নাম দিল ‘উদাহরণ’। শতঞ্জীব লিনোকাটে নামটা খোদাই করে দিল। শতন তখন লিনোকাট ছবি খোদাইয়ের দিকে মন দিয়েছে। ভালো ছবি আঁকত সে। কবিতার পাশাপাশি গল্প লিখত নিয়মিত। ওর গল্পের খাতা ছিল একটা বই। প্রতিটি গল্পের শুরুতে গল্পের ছবি আঁকত। গল্পের শিরোনামও লিখত বিভিন্ন শৈলীতে। তখন গ্রাফিক্সের খুব চল ছিল। তা, বিষ্ণুর ‘উদাহরণ’ বের হতে শুরু হল। শতঞ্জীবই পত্রিকা সাজিয়ে দিত। কয়েকটা সংখ্যা শোভন মুদ্রণী থেকে ছাপা হয়েছিল। তারপর আর বেরিয়েছিল কি না, জানা নেই। কেননা ততদিনে সে সিনেমার দিকে ঝুঁকেছে।

বিষ্ণুর এক দাদা কলকাতায় একটা বড়ো অফিসে কাজ করতেন। সেখানেই চাকরি করতেন ‘দিবারাত্রির কাব্য’ সিনেমার অন্যতম পরিচালক নারায়ণ চক্রবর্তী। দাদার অফিসে যাতায়াতের সূত্রে নারায়ণবাবুর সঙ্গে তার আলাপ হয়ে যায়। অমনি সিনেমার পোকাটা তার মাথায় ঢুকে পড়ে। সে সিনেমার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। একদিকে কবিতা চর্চা, অন্যদিকে সিনেমা নিয়ে পড়াশুনো। মাথায় ঢুকল কবিতা নিয়ে ছবি করবে। শর্ট ফিল্ম। শক্তি চাটুজ্জের ‘অবনী বাড়ি আছো’-র চিত্রনাট্য লিখল। বেশ লিখেছিল। সেই পর্বে উড়নচণ্ডীও তাকে দু-চারদিন সঙ্গ দিয়েছিল। ক-দিন সেই চিত্রনাট্য বগলে নিয়ে কলকাতায়

প্রযোজকেরও খোঁজ করেছিল। একে নতুন পরিচালক, তার উপর কবিতার ছবি— কে দেবে টাকা? কিন্তু হাল ছাড়েনি সে।

সালটা বোধ হয় ১৯৭৯। কৃষ্ণনগরে এল এক সিনেমা কোম্পানি। তারা ‘গোপাল ভাঁড়’ ছবি বানাবে। পরিচালক অমল শূরের প্রথম ছবি। তিনি অসিত সেনসহ বেশ কিছু খ্যাতনামা পরিচালকের সহকারী ছিলেন। কিছুদিন ছাত্র পড়িয়েছেন স্কুলে, কলেজে। তা, তিনি কৃষ্ণনগরে নাটকের ছেলেমেয়ের খোঁজ করলেন। তাদের দিয়ে অভিনয় করাবেন বলে। এতে একটা সুবিধা, বিনে পয়সায় সব হয়ে যায়। শুটিং হল নাকাশিপাড়ার কাছে। নদিয়ার ওই গ্রামাঞ্চলে ছিল সিংহরায়দের জমিদারি। কৃষ্ণনগর উকিলপাড়ায় তাদের বাড়ি। বড়োছেলে সৌম্যেন হয়ে গেল অমল শূরের সহকারী। সেইসব শুটিং-এর ব্যবস্থা করল তাদের জমিদার বাড়িতে। গোঠপাড়ায়। আমাদের বন্ধু সুবীর সিংহ রায়, মানিক কর অভিনয় করল। ওরা তখন ‘নাট্যচক্র’ দলের অভিনেতা। অভিনয় করল সংলাপ-এর কিশোর বিশ্বাস। মানিক পরেও অমল শূরের ছবিতে অভিনয় করেছে। তা, বিষ্ণু সেই দলে ভিড়ে গেল। সিনেমার শুটিং শেষ হওয়ার পর অমল শূরের সঙ্গে সৌম্যেন আর বিষ্ণু টালিগঞ্জে পা রাখল। হয়ে গেল পুরোদস্তুর সিনেমার মানুষ। সিনেমার কাজ শিখতে লাগল।

কিন্তু, সে তো আর একজায়গায় থাকার মানুষ নয়। নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ভিতরে ভিতরে সিনেমার খিদেটা বাড়ছে। খুঁজছে আরও ভালো গুরু। পেয়েও গেল। পার্থপ্রতিম চৌধুরী। তাঁর কাছেই চলে গেল। এই পার্থপ্রতিমই ছিল তার প্রকৃত গুরু। সর্ব অর্থে। কিন্তু, পার্থপ্রতিম তো তখন নিয়মিত ছবি করছেন না। অর্ধেক হয়ে পড়ে থাকছে। তখন বোধ হয় ‘কৃষ্ণপক্ষ’ বা ‘ক্যানভাস’-এর কাজ চলছিল। ছবি দুটি বাজারের মুখ দেখেনি। কিন্তু, নিয়মিত ছবি না হলে তো টাকা পাবে না, পেট চলবে না। ফলে, অন্য পরিচালকদের সঙ্গেও কাজ করতে হচ্ছে। কলকাতায় বাসা ভাড়া করে থাকা, বিয়েও করে ফেলেছে। সুতরাং, রোজগারটা তো করতে হবে। টলিউডে বেশ নাম করল। কাজ করল সৈকত ভট্টাচার্যর সঙ্গে। ‘দুলিয়া’ ছবিতে প্রথম সহকারী। পাশাপাশি বিজ্ঞাপনের ছবি করতে শুরু করেছে। এভাবেই একদিন গিয়ে পৌঁছোল দূরদর্শনে। ততদিনে কবিতা সরে গেছে অনেকটা। বোধ হয় অভিমানে। মনের মধ্যে সিনেমার পোকাটা অবিরাম বকাঝকা করে চলেছে— সিনেমা কর, সিনেমা কর।

কলকাতায় চালু হল ডি ডি বাংলা। শুরু হল বাংলা ধারাবাহিক। বাংলা ধারাবাহিকের প্রথম যুগ। নাট্যকার পরিচালক জোছন দস্তিদার করলেন ‘তেরো পার্বণ’। সাড়া পড়ে গেল। সেটা গত শতাব্দীর আটের দশকের শেষের দিকে। তখন দূরদর্শনের নিয়ম ছিল প্রতিটি ধারাবাহিক হবে তেরো পর্বের। এখনকার মতো এত চ্যানেলও ছিল না। সরকারি চ্যানেল, ফলে বিষয় নির্বাচনেও সতর্ক থাকতে হত পরিচালকদের। পরিচালনায় এলেন তপন সিংহ, ঋতুপর্ণ ঘোষ, গৌতম ঘোষ। বাংলা ধারাবাহিককে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিলেন। ঠিক এই সময় বিষ্ণুও এই ধারাবাহিকের খাতায় নাম লেখাল। সম্ভবত ‘পিতা পুত্র’ ছিল ওর তৈরি প্রথম ধারাবাহিক। মনোজ মিত্রর চিত্রনাট্য। এরপর একে একে আরও কয়েকটা তেরো পর্বের ধারাবাহিক করল। দূরদর্শনের পাশাপাশি বেসকারি চ্যানেলেও করেছিল। ক্রমশ সে কবিতার উঠোন থেকে সরে গেছে ক্যামেরার উঠোনে। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, কবিতা লেখা কি ছেড়ে দিলে?

ওর সস্মিত উত্তর, কেন, লিখছি তো! সব কবিতা এখন সিরিয়ালে।

সাকলাত প্লেস থেকে বিশপ লেফ্রয় রোড

কাজ করতাম ‘নবম দশম’ পত্রিকায়। কিন্তু, সিনেমাপাড়ার খবর লিখতাম অন্য কাগজে বেনামে। মাঝেমধ্যে ‘পরিবর্তন’-এও লিখতাম। তা ছাড়া, সিনেমাপাড়ায় যাতায়াত ছিল অনেকদিন ধরেই। ফলে, একটা টান ছিলই। অফিস ছুটির পর প্রায়ই চলে যেতাম সিনেমাপাড়ায়। কোনোদিন সমীরণ থাকত, নাহলে আমি আর অরুণদা। কখনো একাই চলে যেতাম। আর, স্টুডিয়োতে ঢোকা এত কড়াকড়ি ছিল না। ইচ্ছেমতো যাতায়াত করা যেত। অনেকের সঙ্গেই চেনা-জানা হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুত্ব হয়েছিল কারো কারো সঙ্গে। তাঁরা ছিলেন সিনেমার নেপথ্যের কারিগর। দু-চারজন পরিচালক আর শিল্পীর সঙ্গেও বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কৃষ্ণনগর থেকে অমল শূরের সঙ্গে আলাপ। পরে ঘনিষ্ঠতা। অমলদা যখন ‘রসময়ীর রসিকতা’ করেছিলেন, তখন দু-চারদিন শুটিং-এও ছিলাম। সম্পাদনার কাজ যখন চলছিল, তখন সেখানে কাজ দেখার জন্য থাকতে দিয়েছিলেন। অনেক কারিগরি বিষয় শিখেছিলাম তাঁর কাছ থেকে। অমলদা বলতেন, সিনেমার খুঁটিনাটি না-জানলে ভালো সমালোচক হওয়া যায় না।

তা, সেই সান পাবলিসিটির দৌলতে একদিন রায়বাবুর বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ রায় হাতেখড়ি দিলেন ‘ফটিকচাঁদ’ ছবি করে। ছেলের পরিচালনায় প্রথম ছবি। বাবা সত্যজিৎ পেছন থেকে মদত দিয়ে যাচ্ছেন।

চিত্রনাট্য তিনি লিখেছিলেন। গল্পও তাঁর। সংগীত পরিচালনাও তিনি করছেন। সত্যজিৎ টিম কাজ করছে ‘ফটিকচাঁদ’ ছবিতে। প্রচার পরিকল্পনাও করেছিলেন রায়বাবু নিজে। একই সময়ে সত্যজিৎ রায় ফরাসি টিভির জন্য ‘পিকু’ নামে ছোটো ছবি করেছিলেন। প্রাপ্তমনস্ক ছবি। ছেলের প্রথম ছবি, খুব বড়ো ছবি ছিল না। সত্যজিৎ রায় বোধ হয় ঠিক ভরসা করতে পারছিলেন না। তিনি স্থির করলেন ‘ফটিকচাঁদ’-এর সঙ্গে ‘পিকু’ মুক্তি পাবে। পোস্টারের নকশাও তিনি করছেন।

এসব খবর জানা গেল তাঁর বাড়িতে গিয়েই। একদিন দুপুরে শিল্প বিভাগে বসে কাজ করছি। অরুণদা খুব নীচুস্বরে বলল, ‘সন্ধেবেলায় সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি যাব। তৈরি থাকিস।’

ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। কতদিনের বাসনা তাঁর সামনে বসার।

আমাদের অফিস ছুটির একটু আগেই সমীরণ এল। অফিস ছুটির একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল ঠিকই। কিন্তু, পত্রিকার অফিস। সম্পাদনার কাজ থাকলে দেরি তো হতোই। আবার, বাইরের কোনো কাজের নির্দেশ থাকলে, যেতে হতো। সেটা তো কাজের মধ্যেই পড়ত। কাগজের অফিসে সবই তো নিয়মমতো চলে না। তবুও ছুটির একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল। সমীরণ আসতেই তাকে বললাম রায়বাবুর বাড়িতে যাওয়ার কথা। সে তো একপায়ে খাড়া। সে বলল, ‘বাড়ির ভেতরটা কেমন একটু দেখব।’

কাজের তল্পিতল্পা গুটিয়ে বের হলাম। অরুণদার সঙ্গে সোজা বিশপ লেফ্রয় রোডে। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। আর বুকের মধ্যে হাপর টানছে। অবশেষে বন্ধ দরজার সামনে আমরা। অরুণদা ঘণ্টি বাজালেন। দরজা খুললেন সন্দীপ। ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, ‘অরুণদা এসেছেন।’

অবশ্য, ততক্ষণে তিনি দরজা থেকে সরে গেছেন। ভেতর থেকে মেঘমন্দ্র স্বর ভেসে এল, ‘ভেতরে এসো।’

অরুণদার পেছন পেছন আমরা। বিশাল ঘর। ভেতরের ঘরে যাওয়ার দরজার কাছাকাছি একটা ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে পেটের ওপর বেশ বড়ো একটা ক্লিপবোর্ডে আঁকিবুকি করছেন। বললেন, ‘বোসো।’

নিজের মনে কাজ করতে করতেই বললেন।

অরুণদা বলল, ‘বোস।’

ঘরে কোনো আসবাবপত্র নেই। একদিকে দুটো সোফা আছে। প্রশস্ত মেঝেয় কার্পেট পাতা। ছড়িয়ে আছে বিদেশি রেকর্ড। নানা বই। অগোছালো ঘর। এমন ঘর তো শিল্পীকেই মানায়। বসলাম কার্পেটের ওপর। অরুণদাও বসল। সে তখন ঝোলা থেকে কাজের কিছু সরঞ্জাম বের করেছে। আমার ওদিকে নজর নেই। রেকর্ডগুলো দেখছি, পড়ার চেষ্টা করছি কার সংগীত। বুঝতে পারছি ফটিকচাঁদ-এর সংগীত রচনার জন্য তিনি এইসব বিদেশি রেকর্ড বের করেছেন। এমন সময় ঘরের মধ্যে মেঘ ডাকল, ‘অরুণ।’

অরুণদা উঠে তাঁর সামনে গেল। কিছু ডিজাইন বুঝিয়ে দিলেন। অরুণদা আমাদের দু-জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আমি ‘কিশোর মন’ পত্রিকায় আছি জেনে তাকালেন। বললেন, ‘অদ্রীশ...।’

ছোটো জবাব, ‘হ্যাঁ।’

অদ্রীশ মানে অদ্রীশ বর্ধন। রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা উপন্যাস লেখক। সত্যজিৎ রায়ের ঘনিষ্ঠ। আকাশবাণী কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে প্রেমেন্দ্র মিত্র, সত্যজিৎ রায় আর অদ্রীশ বর্ধন তিনজনে একসঙ্গে একটা গল্প লিখেছিলেন ‘সবুজ মানুষ’ নামে।

তিনি আবার মগ্ন হলেন কাজে।

অরুণদা ছবি আঁকা ড্রয়িং পেপার নিয়ে এল। ওপরে ছবি আঁকা। সিনেমার নামও দেওয়া আছে। অরুণদা একটা ফটোস্ট্রিপ বের করল। বলল, ‘এখানে সাঁটিয়ে দে তো।’

দিলাম। সেটা নিয়ে অরুণদা আবার রায়বাবুর কাছে গেল। তিনি বেশ কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে স্ট্রিপটা তুলে ফেললেন। একটু বাঁকা করে বসিয়ে দিলেন। দেখলাম, একটা সুন্দর ডাইমেনশন তৈরি হল।

ততক্ষণে সন্দীপ রায় একটা বড়ো কাচের প্লেটে তিনরকমের সন্দেশ আর জল রেখে গেছেন। সন্দেশ দেখেই লীলা মজুমদারের পারলৌকিক কর্মের দিনটার কথা মনে পড়ল। সমীরণকে বললাম, ‘সন্দেশ।’

সমীরণ আলতো করে বলল, ‘ব্রাহ্ম।’

অরুণদা বসে বসে পোস্টার ডিজাইন করছে। কিছুটা করে, আবার উঠে যায়। তিনি কিছু পরামর্শ দেন। এভাবে কাজ করতে ঘণ্টা দুয়েক পার হল। তিনি বললেন, ‘মাদ্রাজে কে যাবে?’

অরুণদা আমাকে দেখিয়ে বলল, ‘এ যাবে।’

তিনি আমার হাতে ছোটো খাতার মাপে একটা নকশা দিলেন। একটা খামে ভরে। বললেন, ‘এটা দিয়ে দেবে। আমার নাম করবে।’ তিনি প্রেসের ঠিকানাও লিখে দিলেন।

আমি সাহস করে বললাম, ‘এত ছোটো মাপ থেকে বড়ো পোস্টার করতে পারবে?’

তিনি মৃদু হেসে বললেন, ‘আমি এভাবেই করে দিই। ওরা ডায়াগনালি বড়ো করে নেবে। ওরা জানে।’

‘ফটিকচাঁদ’ ছবির কিছু প্রচারের দায়িত্ব সান পাবলিসিটি পেয়েছিল। দু-একদিন পর মাদ্রাজ, মানে, চেন্নাই যাওয়া স্থির হল। কারণ, আমাকে অফিস থেকে ছুটি নিতে হবে। টিকিট কাটতে হবে। ছবি মুক্তি পেতে তখনও মাস দেড়েক বাকি। ততদিন প্রচারের কাজ চলবে। রায়বাবু সেসব নিয়ে আলোচনায় বসবেন। সম্ভবত উত্তর কলকাতার ‘উত্তরা’ প্রেক্ষাগৃহে ছবি মুক্তি পেয়েছিল। হল সাজানোর কোনো দায়িত্ব ছিল না। তিনি বললেন, ‘ওসব ওরা করে নেবে।’ মানে, ছবির পরিবেশক সংস্থা।

চেন্নাই থেকে ঘুরে আসার দিনসাতেক পর জানা গেল, পোস্টার চলে এসেছে। চেন্নাইয়ের ‘মাদ্রাজ প্রেস’ পাঠিয়ে দিয়েছে। রায়বাবুর ডাকে আবার যাওয়া হল বিশপ লেফ্রয় রোডে। সেদিনের আলোচনার সময় সন্দীপ রায়কে ডেকে নিলেন। ছবি শুরুর আগে সন্দীপ রায় নিজে থাকবেন অতিথি বরণের জন্য। সান পাবলিসিটির তরফে আমি আর সমীরণ থাকব। অরুণদা বলল, ‘এরা দু-জন একটু আগে হলে চলে যাবে।’

সেদিন কিছু বলিনি। পরে সমীরণের সঙ্গে আলোচনা করলাম কীভাবে ডুব দেওয়া যায়। ছোটোদের ছবি ‘ফটিকচাঁদ’-এর সঙ্গে প্রাপ্তমনস্ক ছবি ‘পিকু’ জুড়ে দেওয়াটা ঠিক মন থেকে মেনে নিতে পারছিলাম না। ছেলের ছবিকে প্রোমোট করার জন্য রায়বাবুর এই কাজটাকে অনেকেই সমর্থন করেনি। একটা চাপা

গুঞ্জন ছিল। কিন্তু, সত্যজিৎ রায় ছিলেন অবিচল। ছবি মুক্তির দিনদুয়েক আগে অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বাইরে চলে গেলাম। সমীরণও যায়নি। পত্রিকার কাজে বাইরে যাচ্ছি, অরুণদারও কিছু বলার ছিল না।

এর পরে সান পাবলিসিটি আর কোনো কাজ পায়নি রায়বাবুর কাছ থেকে। আমাদেরও আর যাওয়া হয়নি। উড়নচণ্ডী এই ছোট্ট স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে সিনেমাপাড়ায় অন্য শিল্পীদের সান্নিধ্যে চলে গেল। সেসব অবশ্য কাগজে কাজ করার সৌজন্যেই।

কফি হাউসের মৌতাত

না, কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস নয়। এ ছিল কৃষ্ণনগর জজ কোর্টের মোড়ে লেখরাজদার চায়ের দোকান। আমরা বলতাম কফি হাউস। কেননা, নামে চায়ের দোকান হলেও, চরিত্রে ছিল কফি হাউস। আড্ডার মেজাজও ছিল তেমনি। পাওয়া যেত মাখন টোস্ট। দুধের সরের টোস্ট, ডিম টোস্ট, অমলেট। আর চা তো ছিলই। আমরা ছিলাম চা বিলাসী। কখনো-সখনো দুটো চা চার-পাঁচজন ভাগ করে খাওয়া। কারণ, তখন আমাদের পকেটের অবস্থা ছিল নিদারুণ দুখী, এখনকার বয়ানে দারিদ্র্যসীমার নীচে।

লেখরাজদার দোকানটা ছিল ইংরেজি এল অক্ষরের মতো। দু-দিকে দুটো লম্বা টেবিল। টেবিলের দু-দিকে দুটো বেঞ্চ। বাইরের দিকে যাওয়ার রাস্তায় দু-পাশে আরও দুটো ছোটো বেঞ্চ। ভেতরের দিকে টেবিলে আমরা বসতাম। মূলত সন্ধের পর আড্ডা জমত। রবিবার বা ছুটির দিনে দু-বেলা। দুটো টেবিলের পালিশ ক্রমশ কালো রঙের হয়ে গিয়েছিল। যে টেবিল থেকে রাস্তা দেখা যেত, তারই একপ্রান্তে লেখরাজদা ক্যাশবাক্স নিয়ে বসে থাকতেন। দোকানে একজন কর্মচারী থাকত, সে-ই চা করত। ডিম টোস্ট করত। বৃদ্ধ লেখরাজদা ক্যাশবাক্স আগলে রেখে চারদিকে নজর রাখতেন। তাঁকে কখনো রাগতে দেখিনি। খুব

উঁচুস্বরে কথা বলতেন এমনও নয়। প্রাচীন বৃক্ষর মতো তিনি অবলোকন করে গেছেন বিচিত্র মানুষের বিচিত্র চরিত্র। শহর বা শহরের বাইরের বহু নামি মানুষ ওই দোকানে এসে এক গেলাস চা পান করে গেছেন। ছোটো কাচের গেলাসে তখন চা দেওয়া হতো। এখনও কোনো কোনো দোকানে এই ব্যবস্থা রয়ে গেছে।

তা, ওই লেখরাজদা যে টেবিলে বসতেন, সেখানে নিয়মিত আসতেন দুই রবিদা। পদবি আজ আর মনে নেই। দু-জনেই সরকারি কর্মচারী ছিলেন। একজন মাঝারি মাপের, অন্যজন দীর্ঘাঙ্গ। এঁরা আসতেন সকালের দিকে। দু-জনে মুখোমুখি বসতেন। দু-গেলাস চা নিয়ে কোনো বিষয়ে নিয়ে শুরু হতো আলোচনা, তারপর তুমুল তর্ক। এবং তর্কের শেষে ঘড়ি দেখে উঠে যেতেন। সন্ধের সময় সাড়ে সাতটা নাগাদ আসতেন, রাত ন-টা পর্যন্ত তর্ক পর্ব সমাধান করে উঠে যেতেন। এই টেবিলে প্রায়শই আসতেন নাটকের মানুষজন। তাঁরা নাটকের কথাবার্তা বলে চলে যেতেন। কখনো কখনো শহরের দু-একজন মান্যজনকেও আসতে দেখা যেত। এক সন্ধ্যায় মাথাভরতি কোঁকড়া চুল, ফর্সা দেখতে সাদা শার্ট গায়ে এক ভদ্রলোক এলেন। কারো সঙ্গে এসেছিলেন, নাকি একাই এসেছিলেন, আজ আর মনে নেই। পরিচয় হল। তিনি চিত্রপরিচালক শচীন ভট্টাচার্য। কৃষ্ণনগরের জামাই। বোঝা গেল, লেখরাজদার দোকানে তাঁর আগমন আগেই ঘটেছে। তবে হয়তো আমাদের ঠেক গড়ার আগেই। তখন তাঁর উত্তম-অঞ্জনা অভিনীত ‘রৌদ্রছায়া’ ছবিটা মুক্তি পেয়েছিল। মারকাটারি চলেছিল ছবিটা। পরে আরও ছবি করেন, কিন্তু পাবলিক খায়নি।

অন্য টেবিল, যেটা ভেতরের দিকে ছিল, সেটায় বসতাম আমরা। অবশ্য, অন্য খরিদ্দার বসে থাকলে, আমাদের একটু এদিক-ওদিক করে বসতেই হতো। আমাদের মতো উড়নচণ্ডীদের জন্য তো আর লেখরাজদার ব্যাবসা মার খেতে পারে না। আমাদের সকাল-সন্ধ্যার আড্ডায় নিয়মিত ছিল স্নেহাশিস শুকুল। অসম্ভব ভালো কবিতা লিখত। সাতের দশকে ‘প্রাশ্নিক’ নামে একটা মিনি পত্রিকা বের করে। তখন সে কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ত সংস্কৃত নিয়ে। পরে কলকাতা থেকে পত্রিকাটা বের হতে থাকে। সে যখন স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ত, সেই কলেজের বন্ধু বরেন ভট্টাচার্য আর হেমন্ত আঢ্যর সঙ্গে ‘প্রাশ্নিক’ বের করত স্নেহাশিস। ওই পত্রিকাতেই পড়েছিলাম স্বর্ণ মিত্রর গল্প। পরে ছদ্মনামের খোলস ছেড়ে স্বনামেই লিখত উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। পরে অবশ্য গল্পের উঠোন ছেড়ে সিনেমা তৈরিতেই মন দেয়। উৎপলেন্দু ‘চোখ’ ছবি করার পরেই বিখ্যাত হয়ে

ওঠে। ঠিক সেইসময় তার সঙ্গে আলাপ। সূত্রটা ছিল কাগজের অফিসের চাকরি। পরে নানা কথায় ‘প্রাশ্নিক’ প্রসঙ্গ থেকেই ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। সম্পর্কটা ‘তুই’ পর্যায়ে চলে যায়। ওর ‘দেবশিশু’র পর একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, গল্প লিখছ না কেন?

বলল, আগে কেউ আমার লেখা ছাপতে চাইত না। এখন একটু নাম করেছি তো। এখন সকলেই গল্প চাইছে। দু-একটা কাগজ ছাড়া কোথাও লিখব না ঠিক করেছি।

—স্বর্ণ মিত্রকে মেরে ফেললে?

—আরে, স্বর্ণ মিত্র নামে লিখলে ওরা ছাপবে না। ওরা উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর গল্প চায়। আমার নামটা নিয়ে ব্যাবসা করবে।

কয়েকটা ছবি করার পর তো অসুস্থ হয়ে পড়ল। ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী বসবাস করছে।

হ্যাঁ, বলছিলাম স্নেহাশিসের কথা। লেখরাজদার দোকানে তরুণ কবিদের মধ্যমণি হয়ে রইল সে। বাড়িতে সে একা থাকত। বাপ-মা-ভাইয়েরা থাকত অন্যত্র। ফলে, সে অনেকটা সময়ই দোকানে কাটাত। অনেক সময় দেখেছি সে একাই বসে আছে।

তখন তো সকলেই পড়াশুনো করছে। একা আমি সদ্য কলেজ ছেড়ে চাকরির দরখাস্ত লিখছি। সন্ধের সময় আড্ডার সঙ্গী বাড়ত। কে কখন, কীভাবে এসেছিল মনে নেই, তবে নতুন পল্লি থেকে আসত মহাদেব। মহাদেব সাহা। গল্প লিখত। আসত নন্তু দে। লিখত না, পড়ত। মহাদেব বের করত ‘আজ’ পত্রিকা। অবশ্য ‘আজ’ প্রথম বের করে মহাদেব, শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস আর নারায়ণ নামে এক যুবক। ওরা তিনজন কয়েকটা সংখ্যা বের করার পর মহাদেব একাই বের করত। ওদের পাড়ারই নন্তু ছিল প্রকাশক। পরে অলিখিতভাবে আমি আর স্নেহাশিস জুটে গিয়েছিলাম।

লেখরাজদার দোকানে আরেক নিয়মিত সদস্য ছিল শরীফ। এস এম শরীফ। ইংরেজি নিয়ে পড়ত কৃষ্ণনগর কলেজে। ভালো গল্প লিখত। আসত গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। সেও কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ত। পরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে যায়। আর ছিল সুবীর। সুবীর সিংহরায়। সে হাজারিবাগ কলেজে পড়ত। গৌতম,

শরীফ আর সুবীর বের করত ‘অনুস্বর বিসর্গ’ পত্রিকা। আসত সুশীত। পদবিটা মনে নেই। তার ঝোঁক ছিল প্রবন্ধ লেখায়। পরবর্তী সময়ে এদের অনেকেই লেখার ভুবন থেকে সরে যায়। মহাদেব পুরোপুরি ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে। ও নাটকও করত। নাট্যচক্র দলে। ব্যাবসার চাপে লেখার জগৎ থেকে সরে যেতে হয়, কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত নাটকের সঙ্গে জড়িত ছিল। শরীফও জেলা পরিষদে চাকরি পাওয়ার পর লেখার জগৎ থেকে অপস্রিয়মাণ হয়। কিন্তু, লেখক বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাইরে চলে যায়। এসব কারণে ‘অনুস্বর বিসর্গ’, ‘আজ’ বন্ধ হয়ে যায়। স্নেহাশিস কলকাতায় চলে যায় এমএ পড়তে। পড়াশুনোর পরেই সে চাকরি পেয়ে গেলে কলকাতাতেই থিতু হয়। তবে, কবিতা লেখা ছাড়েনি। সে কাব্যনাটক লেখার দিকে মন দেয়। একসময় তো নিয়মিত নাটক লিখত। ‘প্রাশ্নিক’ পত্রিকায় বেরিয়েছিল ওর প্রথম নাটক ‘চতুর্থ সন্তান’। সেটা আকাশবাণীতে প্রচারিত হয়। তার আরেকটা নাটক ‘দিব্যি রইলো’-ও প্রচারিত হয় আকাশবাণীতে। সেইসময় বেরিয়েছিল ‘নিশ্চুপ রাজা’। সেই বই আমরা সমবেতভাবে বিক্রি করেছিলাম। নয়ের দশকের কলকাতা থেকে বের করল ‘বর্ণমালা’। প্রথম কয়েকটা সংখ্যায় প্রচ্ছদে তিনজন সম্পাদকের নাম থাকত— স্নেহাশিস শুকুল, সমরেন্দ্র মণ্ডল, শিখা শুকুল। পরে সে একাই বের করত। লেটার প্রেসে ছাপা হতো সে-পত্রিকা। এই পত্রিকার নামাঙ্কন করে দিয়েছিলেন চিত্রশিল্পী নিতাই ঘোষ। বেশ কিছু সেট করে দিয়েছিলেন নানা সময়ে প্রচ্ছদে ব্যবহার করার জন্য। বেশিদিন বের করা যায়নি সেই পত্রিকা। মূলত অর্থাভাবের জন্য। এই পত্রিকাতেই বেরিয়েছিল বিদ্যাসাগর অনূদিত কাহিনি নিয়ে ‘তামস ইম্ফল ও ইয়ারিকো’, মহাভারত অবলম্বনে অর্ধসত্য, ক্ষত্তা। বই আকারে বেরিয়েছিল ‘তামস ইম্ফল’ আর ‘অর্ধসত্য’। নিতাই ঘোষ প্রচ্ছদ করে দিয়েছিলেন। এর আরও কয়েকটা নাটকের পাণ্ডুলিপি কোনো এক সুধীজন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবেন বলে লিখেছিলেন। কিন্তু, হয়নি। বেশ কিছুদিন পর জানতে পারা গেছিল তিনি আর ইহজগতে নেই। তাঁর পরিবারও ফেরত দিতে পারেনি। সম্ভবত এইসব বাজে কাগজ বিক্রিওয়ালার কাছে চলে যায়। অনেক পরে আরেকটা নাটক খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। তার বেশ কিছু অংশ উইপোকা গলাধঃকরণ করে। সেই নাটক স্নেহাশিসের সাহায্যে পুনরুদ্ধার করে ছাপা হয়েছিল ‘অন্তরীক্ষ’ পত্রিকায়। কবিতা বইয়ের একটা পাণ্ডুলিপিও সে প্রস্তুত করেছিল ছাপার জন্য। কিন্তু, সেসব আর হয়ে ওঠেনি। তার শরীরের মাত্রাতিরিক্ত শর্করা আর বিকল কিডনি তাকে সমস্ত সৃষ্টি থেকে

সরিয়ে নেয়। তারপর একদিন চলে যায় নেইলোকের বাসিন্দা হয়ে।

লেখরাজদার দোকানে আসত সমর ভট্টাচার্য। আমার নানুদা। চাকরি করত বিডিও অফিসে। একটু বেশি বয়সে কৃষ্ণনগরে কলেজে ভরতি হয়ে স্নাতক হয়েছিল। তারপর চতুর্থ থেকে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী হয়ে যায়। তার মাকে ডাকতাম মাসিমা বলে। কত দুপুর কেটেছে নানুদার বাড়িতে আড্ডা দিয়ে। সকলের সঙ্গে যতটা পারা যায় যোগাযোগ রাখত। সমরদা বিয়ে করল। সন্তানের জনক হল। ওর স্ত্রী বামপন্থী মহিলা সমিতির প্রথম শ্রেণির কমরেড ছিলেন। হঠাৎই তাঁর প্রয়াণ ঘটল। ততদিনে মাসিমাও আর নেই। আমরাও চলে গেছি অন্যত্র। লেখরাজদার দোকানও বিক্রি হয়ে গেছে অনেক বছর। ফলে, সকলেই এককভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। সমরদা বদলি নিয়ে স্বগ্রামে চলে যায়। সেও কিডনি বিকল হয়ে দেহ রাখে। পরবর্তী সময়ে তার সমস্ত লেখা একত্র করে প্রকাশ করেছে ‘সুপ্রকাশ’। এক বিস্মৃতপ্রায় লেখককে দু-মলাটে ধরে রেখে বাঁচিয়ে রেখেছে ‘সুপ্রকাশ’। শতঞ্জীব রাহার আন্তরিক সম্পাদনায়। আসলে, সমরদা আমাদের সকলেরই তো প্রিয় মানুষ ছিল।

আর আসত গৌতম মুখোপাধ্যায়। সাতের দশকের প্রথমদিকে ও এল গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী হয়ে। গল্প লিখত। উকিলপাড়ায় বাড়ি। ওদের বাড়িটা ‘উকিল বাড়ি’ নামে পরিচিত ছিল। শ্যামনগরে থাকত পড়াশুনোর জন্য। স্নাতক হওয়ার পর কৃষ্ণনগর ফিরল, তারপরেই লেখরাজদার দোকান। ও যেমন ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমনি ঝড় তুলে চলে গেল। গৌতম মুখোপাধ্যায় ছিল ভালো সংগঠক। কোনো দল না করলেও বামপন্থার দিকে ঝোঁক ছিল তীব্র। ওর মাথায় নানা পরিকল্পনা ঘুরত। সেই পরিকল্পনার ফলশ্রুতি ‘কৃষ্ণনগর সাংস্কৃতিক মেলা’। শহরের তাবৎ লেখক, শিল্পীদের জড়িয়ে তিনদিনের উৎসব করা চাড্ডিখানি কথা নয়। কিন্তু, তা সফল হলো। পর পর চারবছর সে-মেলা চলেছিল। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলে সেটা কীভাবে সফল করা যায়, তা সে দেখিয়েছিল। এ নিয়ে পরে সময় পেলে বলব। শুধু মেলা নয়, ও একটা চলমান সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলল। নাম হল ‘প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন’। শহরের বিভিন্ন জায়গায় শিল্পীরা বসে যেতেন ছবি আঁকতে। কবিরাকবিতা পাঠ করতেন, শিল্পীরা গাইতেন খোলা গলায় গান। ভিড় করত পথচারীরা। পাশে টাঙানো থাকত কাপড়ের ব্যানার। কোনো শব্দযন্ত্র ব্যবহার করা হতো না। প্রায় বছরখানেক চলার পর সে-আন্দোলন স্তিমিত হয়ে

গেল কুশীলবদের জীবিকার তাগিদে অন্যত্র চলে যাওয়ার ফলে। গৌতমও সরকারি হিসাব পরীক্ষা দপ্তরে চাকরিসূত্রে কিছুদিন বাইরে চলে যাওয়ায় লেখা ও আন্দোলনও বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম মেলা করার সময়েই সে চাকরি পেয়ে গিয়েছিল। তখন তার চাকরিক্ষেত্র ছিল কৃষ্ণনগর। এদিক-ওদিক বদলি হওয়ার পর আবার কৃষ্ণনগর যায়। পরে চলে আসে কলকাতায়। তখন সে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে অনেক দূরে। সে দুর্মূল্য পয়সা সংগ্রহ ও তার ইতিহাস নিয়ে চর্চা করছিল। কিন্তু, কর্কট ওকে আক্রমণ করল। বছর দুয়েক চিকিৎসা করিয়েও সফল হলো না। অকস্মাৎ চলে গেল সে।

অন্তরীক্ষর দিনকাল

জীবনের বেলা ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে। হাঁটছি সন্ধের দিকে। এ সেই উড়নচণ্ডী-জীবনের পরিক্রমা, কত মানুষের সঙ্গে পরিচয়, কেউ বেঁচে থাকেন স্মৃতির গহ্বরে, কেউ হারিয়ে যান। কত মানুষের সঙ্গে সখ্য, বৈরিতা না-থাকলেও মালিন্যের সংখ্যাও বুঝি কম নয়। হাঁটার পথে হোঁচট খাব না, তা কি হয়? হয় না তো। এই পথের পাঁচালিতে কেউ জোর করে স্থান দখল করেননি, যিনি এসেছেন আপনি এসেছেন। তাঁকে ডেকে আনার দরকার পড়েনি। এই রচনার পড়ন্ত বেলায় যেমন এসে পড়লেন কৃষ্ণনগরের তুহিন দত্ত তাঁর মৃত্যুসংবাদ নিয়ে। সখ্য ছিল না ঠিকই, কিন্তু পরিচয়ের আগল ভেঙে একটু তো এগিয়েছিলেন। ছিলেন নাটকের মানুষ। ‘সংলাপ’ নামে একটা নাটকের দলের কাণ্ডারি। একদা মুদ্রিত নাটক করলেও পরবর্তীকালে নিজেই নাটক লিখেছেন। কত অভিনেতা, অভিনেত্রী তৈরি করেছেন তিনি। বেশ কয়েক বছর আগে তাঁর স্ত্রী রত্না প্রয়াত হন। তিনিও অভিনয় করতেন। বার্ধক্যের জীর্ণতা তাঁকে গ্রাস করেনি বলেই শুনেছিলাম। হয়তো ভুল ছিল সেই সংবাদ। কিন্তু, অসুস্থ তো ছিলেনই। সে তো অনেকেই থাকেন। তুহিনদাও ছিলেন। আর, ছিলেন বলেই

আছেন। কৃষ্ণনগরের নাট্যচর্চায় প্রবলভাবে আছেন এই আদ্যন্ত কৃষ্ণনাগরিক।

এভাবেই থেমে যায়। থেমে যেতে হয়। কিন্তু, সব থামা তো থেমে যাওয়া নয়। কোনো কোনো থেমে যাওয়ার ভেতরে থাকে নতুন করে চলার ইঙ্গিত। এই যেমন ‘অন্তরীক্ষ’ পত্রিকার জন্মলগ্নে হয়েছিল কোনো এক পঁচিশে বৈশাখ। পত্রিকার জন্ম হয়েছিল যেমন অকস্মাৎ, মৃত্যুও তো হতে পারত তেমনই। মহানগর কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রান্তসীমায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার গা ঘেঁষে ঠাকুরপুকুর জনপদ। প্রাচীন এই জনপদে কিছু বছর আগে পর্যন্ত মালিন্যের চিহ্ন ছিল স্পষ্ট। নব্বই দশকের প্রায় শেষের দিকে আলাপ হল কয়েক জন তরুণের সঙ্গে। ওরা কবিতা লেখে। অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সঙ্গেও জড়িত। সত্তর দশকের কবি স্নেহাশিস শুকুলও এখানে বসবাস করতে শুরু করেছিল। আমিও ঠাঁই গেড়েছি এখানে। আলাপের কিছুদিন পরেই ওদের মনের ইচ্ছাটা টের পেলাম। ওরা একটা পত্রিকা করতে চায়। কিন্তু, দিশা পাচ্ছে না। সে বোধ হয় ১৯৯৬-৯৭ সাল। পথপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতেই ঠিক হল পঁচিশে বৈশাখ পত্রিকা বেরোবে। ঠিক হল চার পৃষ্ঠার ডিমাই সাইজের কাগজ। আপাতত শুধু কবিতা থাকবে। সম্পাদক কে হবে? প্রস্তাব দিলাম, সকলেই সম্পাদক।

অনির্বাণ বলল, তা হয় নাকি? একজন-দু-জন তো হোক।

বললাম, তুমি সম্পাদক।

সামনে ছিলেন ‘সমকাল’ নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক, অভিনেতা সোমেন মণ্ডল। এ জি বেঙ্গলে কাজ করতেন। তিনিও গোপনে কবিতা চর্চা করতেন। প্রস্তাব দিলাম, অনির্বাণ আর সোমেনদা সম্পাদক হোন, আর সৃজন গোমস প্রকাশক।

ওরা জোর করল আমার নামটা রাখতে। ওদের ইচ্ছা পূরণ হল। চায়ের গেলাস হাতে কার কার কবিতা রাখা হবে, কীভাবে হবে, কত টাকা খরচ হবে, প্রেস কোথায়— এসব ঠিক করার মাঝেই অনির্বাণ উধাও হয়ে গেল। ফিরে এল নগদ টাকা আর বিজ্ঞাপন নিয়ে। ওর এক বন্ধুর দোকানের বিজ্ঞাপন। পঁচিশে বৈশাখের ভোরে রবীন্দ্রসদনে দাঁড়িয়ে পত্রিকা বিক্রির সে কী উত্তেজনা ওদের। এই উত্তেজনা এবং পত্রিকা বিক্রি ভালো হওয়াটা ওদের অক্সিজেন দিল। তোড়জোড় শুরু হল পরের সংখ্যার। ঠিক হল বছরে চারটে সংখ্যা বেরোবে। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই পত্রিকার অবয়ব বদলাল। হলো বইয়ের মাপে। ছাপাখানার পরিভাষায়

একের আট ডিমাই সাইজ। বের হলো কয়েক সংখ্যা। লিটল ম্যাগাজিন যেমন হয়। এরই মধ্যে সোমেনদা সরে গেলেন। এল হীরক মুখোপাধ্যায়, অনির্বাণের সঙ্গী হয়ে। পত্রিকা মাঝে মাঝেই রূপ বদল করছে। কখনো বড়ো, কখনো ছোটো। এল অলংকরণ। তরুণ শিল্পী গোপাল চৌধুরী কলমের আঁচড়ে ছবি আঁকলেন কবিতার। এরই মধ্যে নিদারুণ অর্থসংকট। ছাপাখানায় ঋণ। পত্রিকা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। অনির্বাণ কোথা থেকে টাকা সংগ্রহ করে সেযাত্রা রক্ষা করল। পরের সংখ্যায় পত্রিকার আসন্ন মৃত্যুর কথা ঘোষণা করা হল। ততদিনে সম্পাদনার পুরো দায়িত্বটা এসে পড়েছে এই উড়নচণ্ডীর ঘাড়ে। ইতিমধ্যে এসে পড়েছে সঞ্জয়। ব্যাঙ্ক কর্মচারী। সে কিছু বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে লাগল। ওদিকে সৃজন গোমস কেটে পড়েছে। সে ইংরেজি কাগজ বের করতে শুরু করেছে। তৈরি হল একটা দল। অনির্বাণ ঘোষ, হীরক মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় চৌধুরীকে নিয়ে। সঞ্জয়ের নাম ছাপা হতে শুরু হল প্রকাশক হিসেবে। পত্রিকা পৃথুলা হল। আকাশে ওড়ার বাসনা নিয়ে যে তরুণ নবীনরা ‘অন্তরীক্ষ’ শুরু করেছিল, তারা নানা ব্যস্ততায় আর সময় দিতে পারল না। সঞ্জয় বদলি হতে হতে ইচ্ছেটা সত্যিই অন্তরীক্ষে মিলিয়ে গেল। এখনও ইচ্ছে জাগে, কিন্তু সময়ের বড়ো অভাব। অনির্বাণ ঘোষ শিশু সাহিত্যিক হিসেবে নাম করে ফেলল। তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরে যোগ দেওয়ার পর সে আরও ব্যস্ত কবি হয়ে যায়। নিজেই একটা পত্রিকা বের করতে শুরু করে। ক্রমশ ‘অন্তরীক্ষ’ প্রায় কুড়ি বছর পথ চলার পর আপনা থেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। থামতে না-চাইলেও থেমে যেতে হয়।

তবুও কেউ কেউ তো ফিনিক্স পাখির মতো জেগে ওঠে, দীর্ঘ ঘুমের পর। ‘অন্তরীক্ষ’ও এভাবে জেগে ওঠে কখনো কখনো। করোনাকালীন সময়ে পত্রিকা ‘অনলাইন’ হলো। অনির্বাণ দায়িত্ব নিল। কিন্তু, তার ব্যস্ততার কারণে আবার ঘুমিয়ে পড়ল পত্রিকা।

এক উড়নচণ্ডীর সঙ্গে আরও চার উড়নচণ্ডী মিলে পত্রিকা নিয়ে নানা কসরত চলেছে বেশ কিছুদিন। একবার ঠিক হল প্রতিমাসে পত্রিকা বেরোবে। বের হল। প্রতিমাসে থাকত একজন প্রবীণ কবির সাক্ষাৎকার। বেশ মনে আছে, মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই ছিল কবি স্বদেশরঞ্জন দত্তর সঙ্গে কথালাপ। স্বদেশদা পঞ্চাশ দশকের কবি। গল্পও লিখতেন। রবীন্দ্র সরোবরে একটা ঘর নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি। চাকরি করতেন কলকাতা পুরসভায়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। যুক্ত ছিলেন প্রগতিশীল লেখক সংঘর সঙ্গে। তিনি আমাদের বন্ধুর মতো হয়ে গিয়েছিলেন। সময় পেলেই তাঁর বাঁশদ্রোণীর বাড়িতে হাজির হতাম। কতদিন বিনা বিজ্ঞপ্তিতে হাজির হয়েছি। হয়তো পেতাম, হয়তো পেতাম না। চলত নানা কথার আড্ডা। বয়স একদিন তাঁকে নিয়ে পাড়ি দিল অন্য কোথাও। পৃথিবীর অগোচরে।

মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা যে কত কঠিন, তা টের পেয়েছিলাম কিছুদিন পরেই। টান পড়ল অর্থের। পত্রিকা যতজন কেনেন, বিনে পয়সায় দেওয়া তার চেয়েও বেশি। স্বদেশদাকে দেখেছি নিয়মিত পত্রিকা পয়সা দিয়ে কিনতেন। প্রণব চট্টোপাধ্যায় পত্রিকার মূল্য চুকিয়ে দিতেন না ঠিকই, কিন্তু মাঝেমধ্যে হাতে গুঁজে দিয়ে বলতেন, এটা রাখো। পত্রিকা বের করতে খরচ হচ্ছে তো।

পত্রিকার জন্য অর্থ খরচ করার এই প্রবণতা বামপন্থী লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যেত। আবার অনেক সোচ্চার বামপন্থীকে দেখেছি বিনে পয়সায় পত্রিকা না-দেওয়ার জন্য অনুযোগ করেছেন। দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে দুটো ভাগ লক্ষ করতাম। একদল ছিল বামঘেঁষা দক্ষিণপন্থী। হয়তো বামফ্রন্ট সরকারে থাকার ফলে সুযোগ-সুবিধা আদায়ে ছদ্মবেশ ছিল ওটা। তবে, তাঁরা দাম দিয়ে পত্রিকা কেনার চেষ্টা করতেন। আর, পুরো দক্ষিণপন্থীদের কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম।

মূলত আর্থিক কারণেই মাসিক পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। ‘অন্তরীক্ষ’ ফিরে এল অনিয়মিত সংখ্যায়। ক্রমশ সে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল। ‘অন্তরীক্ষ’ হারিয়ে গেল নিঃসীম অন্তরীক্ষে। পড়ে রইল স্মৃতি-বিস্মৃতি আর পুরোনো সংখ্যার ঝাঁপি।

সম্পূর্ণ বইটি পড়ার আগ্রহ হলে সংগ্রহ করার জন্য আপনার কাছের বইয়ের দোকানে বলতে পারেন। সরাসরি প্রকাশকের কাছ থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। প্রকাশকের ঠিকানা ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর দেওয়া রইলো।

সুপ্রকাশ

কলেজ স্ট্রীট বইপাড়ায় বিক্রয়কেন্দ্র

সুপ্রকাশ

১৬, রাধানাথ মল্লিক লেন

কলকাতা ১২

বাণিজ্য-আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ : ৯৪৭৭৫৩০৪৪০